بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ২৮. www.motaher21.net

لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ

"পথ-নির্দেশক।"

" The Guide."

সূরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-1

الٓمّٓ

আলিফ লাম মীম।

নামকরণ ও অবতীর্ণের সময়কাল:

اَلْبَقَرَةُ (আল-বাকারাহ) শব্দের অর্থ গাভী। এ সূরার ৬৭-৭১ নং আয়াতে বানী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত গাভী সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেই বাকারাহ নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এটি মদীনায় অবতীর্ণ বিধি-বিধানসম্বলিত সূরাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সূরা। বিশিষ্ট তাবিঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন: সূরা আল-বাকারার প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনদের ব্যাপারে, পরের দু'টি আয়াতে কাফিরদের ব্যাপারে এবং পরের ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আল-বাকারাহ্‌র গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

[১] সূরাটি সবচেয়ে বড় সূরা।

[২] সূরাটি সবচেয়ে বেশী আহকাম বা বিধি-বিধান সমৃদ্ধ। [ইবনে কাসীর]

[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করেছেনঃ

আবু উমামাহ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর; কেননা, কেয়ামতের দিন এই কুরআন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দু'টি পুষ্প তথা সূরা আল- বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াত কর, কেননা কেয়ামতের দিন এ দু'টি সূরা এমনভাবে আসবে যেন এ দু'টি হচ্ছে দু'খণ্ড মেঘমালা, অথবা দু'টুকরো কালো ছায়া, অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি। এ দু'টি সূরা যারা তিলাওাত করবে তাদের থেকে (জাহান্নামের আযাবকে) প্রতিরোধ করবে। তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত কর। কেননা, এর নিয়মিত তিলাওয়াত হচ্ছে বারাকাহ্ বা সমৃদ্ধি এবং এর তিলাওয়াত বর্জন হচ্ছে আফসোসের কারণ। আর যাদুকররা এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না'। [মুসলিম-৮০৪]

অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে বাতিল তথা যাদুকরের যাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৪৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিওনা, নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়'। [মুসলিমঃ ৭৮০]

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পড়া হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করেনা। [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৮৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'প্রত্যেক বস্তুরই উচ্চ স্তম্ভ রয়েছে, কুরআনের সুউচ্চ শৃংগ হলো, সূরা আল-বাকারাহ্। [তিরমিযীঃ ২৮৭৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৫৯]

[৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে ডাকার সময় বলেছিলেনঃ 'হে সূরা আল-বা বাকারাহ্র বাহক (জ্ঞানসম্পন্ন) লোকেরা'। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২১৮]

৫) সূরা আল-বা বাকারাহ্ তিলাওয়াত করলে সেখানে ফিরিশতাগণ আলোকবর্তিকার মত অবতরণ করে। এ প্রসংগে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [বুখারীঃ ৫০১৮,মুসলিমঃ ৭৯৬]

৬) যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সূরা আল-বাকারাহ জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে আমীর বানাতেন। [তিরমিযী: ২৮৭৬, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ:৩/৫, হাদীস নং ১৫০৯, ৪/১৪০, হাদীস নং ২৫৪০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৬১১, হাদীস নং ১৬২২]

৭) অনুরূপভাবে যারা সূরা আল-বাকারাহ এবং সূরা আলে-ইমরান জানতেন, সাহাবাদের নিকট তাদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১২০,১২১]

৮) সর্বোপরি এ সূরাতে আল্লাহ্র "ইসমে আযম" রয়েছে যার দ্বারা দো'আ করলে আল্লাহ্ সাড়া দেন। এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এ আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, যাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

রহমান, রহীম আল্লাহ্র নামে

[১] আলিফ, লাম, মীমঃ এ হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় 'হরুফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। ঊনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের হরুফে মুকাত্তা'আত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১৪টি। একত্র করলে দাঁড়ায়:

(نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لهُ سِرٌّ)

"প্রাজ্ঞ সত্বার পক্ষ থেকে অকাট্য বাণী যাতে তার কোন গোপন ভেদ রয়েছে"। মূলতঃ এগুলো কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য, যথা—(الٓمٓصٓ - حٰمٓ - الٓمٓ) । এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন করে পড়া হয়ে থাকে। যথা---(الف - لام - ميم) (আলিফ্-লাম্-মীম্)। এ বর্ণগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষার বর্ণমালা হতে গৃহীত। যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং শব্দ তৈরী করে। কিন্তু কি অর্থে এবং এসব আয়াত বর্ণনার কি রহস্য রয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে চারটিঃ

১) এগুলোর কোন অর্থ নেই, কেবলমাত্র আরবী বর্ণমালার হরফ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

২) এগুলোর অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আমরা এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধুমাত্র তিলাওয়াত করবো।

৩) এগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ কুরআনের কোন বিষয় বা কোন আয়াত বা শব্দ অর্থহীনভাবে নাযিল করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কেউ এ আয়াতসমূহের অর্থ জানেনা, যদি কেউ এর কোন অর্থ নিয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কুরআনের কোন অংশ অনর্থক নাযিল করেননি।

৪) এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরুফে মুকাত্তা'আতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু 'মুতাশবিহাত' আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে থাকলেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্র নামের তত্ব বিশেষ। আবার অনেকে এগুলোর স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। যেমন আলেমগণ (الم)– এ আয়াতটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেনঃ

৫) এখানে আলিফ দ্বারা আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ যা মুখের শেষাংশ থেকে উচ্চারিত হয়, লাম বর্ণটি মুখের মধ্য ভাগ থেকে, আর মীম বর্ণটি মুখের প্রথম থেকে উচ্চারিত হয়, এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে এ কুরআনের শব্দগুলো তোমাদের মুখ থেকেই বের হয়, কিন্তু এগুলোর মত কোন বাক্য আনতে তোমাদের সামর্থ্য নেই।

৬) এগুলো হলো শপথ বাক্য। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দিয়ে শপথ করেছেন।

৭) এগুলো কুরআনের ভূমিকা বা চাবির মত যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনকে শুরু করেন।

8) এগুলো কুরআনের নামসমূহ হতে একটি নাম।

৯) এগুলো আল্লাহ্র নামসমূহের একটি নাম।

১০) এখানে আলিফ দ্বারা (أنا) (আমি) আর লাম দ্বারা আল্লাহ্ এবং মীম দ্বারা (أعْلَمُ) (আমি বেশী জানি), অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ এর অর্থ বেশী জানি।

১১) আলিফ দ্বারা আল্লাহ্, লাম দ্বারা জিবরীল, আর মীম দ্বারা মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ]

১২) এভাবে এ আয়াতের আরও অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। তবে আলেমগণ এসব আয়াতের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করলেও এর কোন একটিকেও অকাট্যভাবে এগুলোর অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। এগুলো উল্লেখের একমাত্র কারণ আরবদেরকে অনুরূপ রচনার ক্ষেত্রে অক্ষম ও অপারগ করে দেয়া। কারণ এ বর্ণগুলো তাদের ব্যবহৃত ভাষার বর্ণমালা এবং তারা যা দিয়ে কথা বলে থাকে ও শব্দ তৈরী করে থাকে, তা থেকে নেয়া হয়েছে।

১৩) মোটকথা, এ শব্দ দ্বারা আমরা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো লাভ করতে পারি, যদিও এর মধ্যকার কোন্ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা জানি না। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়। অথবা, এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল-সোজা পথ লাভের মধ্যে গলদ থেকে যাবে এমন কোন কথাও নেই। তাই এর অর্থ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে অনুসন্ধান করার অতবেশী প্রয়োজনও নেই।

সূরা বাকারার ফযীলত:

সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কে অনেক সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন: সূরা বাকারাহ এক হাজার সংবাদ, এক হাজার আদেশ ও এক হাজার নিষেধ সম্বলিত একটি সূরা। (তাফসীর ইবনে কাসীর, আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, অত্র আয়াতের তাফসীর)

সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ البَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ البَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

"তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত কর না। কেননা যে বাড়িতে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয় তাতে শয়তান প্রবেশ করে না।"(তিরমিযী হা: ২৮৭৭, সহীহ) সহীহ মুসলিম এর বর্ণনায় রয়েছে:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

“যে বাড়িতে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয় সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।” (সহীহ মুসলিম হা: ৫৩৯)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন এরূপ না পাই যে, সে এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে পড়তে থাকে, কিন্তু সে সূরা বাকারাহ তেলাওয়াত করে না। জেনে রেখ, যে ঘরে সূরা বাকারাহ তেলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান দ্রুত পালিয়ে যায়। সবচেয়ে খালি ও মূল্যহীন সেই ঘর, যে ঘরে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব (কুরআন) পাঠ করা হয় না। (নাসাঈ হা: ৯৬৩, হাদীসটি হাসান)

উসাইদ বিন হুজাইর (রাঃ) একদা রাতে সূরা বাকারাহ পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁর পাশেই বাঁধা ঘোড়াটি হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করে। তিনি পাঠ বন্ধ করলে ঘোড়াও লাফানো বন্ধ করে দেয়। আবার তিনি পড়তে শুরু করেন এবং ঘোড়াও লাফাতে শুরু করে। তিনি পুনরায় পড়া বন্ধ করেন, ঘোড়াটিও স্তব্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়বারও এরূপ ঘটে। তাঁর শিশু পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়ার পাশে শুয়ে ছিল। কাজেই তিনি ভয় করলেন যে, হয়তো ছেলের গায়ে আঘাত লেগে যাবে। সুতরাং তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে, ঘোড়ার চমকে ওঠার কারণ কী? সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘটনা শুনে বললেন: উসাইদ! তুমি পড়েই যেতে। উসাইদ (রাঃ) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তৃতীয় বারের পরে প্রিয় পুত্র ইয়াহইয়ার কারণে আমি পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি মাথা আকাশের দিকে উঠালে ছায়ার ন্যায় একটি আলোকিত জিনিস দেখতে পাই এবং মুহূর্তেই তা ওপরের দিকে উঠে শূন্যে মিশে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন: তুমি কি জান সেটা কী ছিল? তাঁরা ছিলেন গগণবিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় ফেরেশতা। তোমার (পড়ার) শব্দ শুনে তাঁরা নিকটে এসেছিলেন। যদি তুমি পড়া বন্ধ না করতে তাহলে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এরূপ থাকতেন এবং মদীনার সকল লোক তা দেখে চোখ জুড়াতো। একজন ফেরেশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতেন না। (সহীহ বুখারী হা: ৫০১৮৮, সহীহ মুসলিম হা: ২১৯২)

সূরা আল-বাকারাহ ও আলি-ইমরানের ফযীলত: আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বসেছিলাম। অতঃপর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনলাম তোমরা সূরা বাকারাহ শিক্ষা গ্রহণ কর। কারণ এর শিক্ষা অতি কল্যাণকর এবং এর শিক্ষা বর্জন অতি বেদনাদায়ক। এমনকি বাতিল পন্থীরাও এর ক্ষমতা রাখে না।

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন- সূরা বাকারাহ ও সূরা আলি-ইমরান শিক্ষা কর। এ দু’টি জ্যোতির্ময় নূরবিশিষ্ট সূরা। এরা এদের তেলাওয়াতকারীর ওপর সামিয়ানা, মেঘমালা অথবা পাখির ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামাতের দিন ছায়া দান করবে। (মুসনাদ আহমাদ

হা: ৩৪৮-৩৬১, মুসতাদরাকে হাকীম হা: ৫৬০, ইমাম হাকীম বলেন: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে কিন্তু তিনি বর্ণনা করেননি)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: কিয়ামাতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীদেরকে আহ্বান করা হবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলি-ইমরান (তেলাওয়াতকারীদের) অগ্রে অগ্রে চলবে মেঘের ছায়া বা পাখির মত। এরা জোরালোভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। (সহীহ মুসলিম হা: ৫৫৩)

১ নং আয়াতের তাফসীর:

الم-(আলিফ-লাম-মীম) এ জাতীয় অক্ষরগুলোকে

الحروف المقطعات

"হুরুফুল মুক্বাত্বআত"বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বলা হয়। পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ঊনত্রিশটি সূরার শুরুতে এরূপ অক্ষর বা হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। যার প্রথমটি হচ্ছে সূরা বাকারার "الم"। এসবের মধ্যে কতকগুলো এক অক্ষর, আবার কতকগুলো দুই, তিন, চার এবং সর্বোচ্চ পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট।

নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীর পাওয়া যায় না। এ জন্য বলা হয়

"اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ"

মহান আল্লাহই এগুলোর ব্যাপারে ভাল জানেন। (আইসারুত তাফাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর) তবে এর ফযীলত প্রসঙ্গে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি এ কথা বলি না যে, আলিফ- লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে একটি করে নেকী দেয় হবে। আর একটি নেকীর প্রতিদান দশ গুণ করে দেয়া হবে। (তিরমিযী হা: ২৯১০, সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা: ১৪১৬, সহীহ)

কেউ বলেছেন, এগুলোর অর্থ আছে, এগুলো সূরার নাম। কেউ বলেছেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম। আবার কেউ বলেছেন এগুলোর কোন অর্থ নেই। কারণ আরবি ভাষায় এরূপ বিচ্ছিন্ন অক্ষরের কোন অর্থ হয় না। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিন (রহঃ) এ কথাই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন: এগুলো এমন বিষয় যার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সুতরাং এগুলোর তাফসীর আল্লাহ তা'আলার দিকেই সোপর্দ করা উচিত। (কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

অতএব "হুরুফুল মুক্বাত্বআত" যা সূরার শুরুতে রয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে চুপ থাকাই সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার কাজ। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না, বরং বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলো অনর্থক অবতীর্ণ করেননি। এগুলোর পেছনে হিকমত রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

তাছাড়া তৎকালীন আরবরা সাহিত্যে ছিল বিশ্ব সেরা। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কুরআন বিশেষ করে এ সকল বিচ্ছিন্ন অক্ষর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ কুরআনের মত একটি কুরআন অথবা একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে আসতে। এমনকি একটি আয়াত তৈরি করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করলেন, তারা তাতেও সক্ষম হয়নি। এ চ্যালেঞ্জ কিয়ামত অবধি বহাল থাকবে, কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে কুরআন কোন গণক, জ্যোতিষী বা মানুষের তৈরি কিতাব নয়, বরং বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে একটি চিরস্থায়ী মু'জিযাহ।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সূরা বাকারাহ অতীব ফযীলতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরা।

২. যে বাড়িতে সূরা বাকারাহ তেলাওয়াত করা হয় সে বাড়িতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। তাই আমাদের বেশি বেশি এ সূরা তেলাওয়াত করা দরকার।

৩. "হুরুফুল মুক্বাত্বআত"বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরের সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতএব এর তাফসীর আল্লাহ তা'আলার দিকেই সোপর্দ করা উচিত।

৪. কুরআনুল কারীমের একটি অক্ষর তেলাওয়াত করলে দশটি নেকী হয়, বুঝে তেলাওয়াত করুক আর না বুঝে তেলাওয়াত করুক। তবে অবশ্যই বুঝে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতে হবে।

৫. কুরআন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।২ এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য৩

তাফসীর :

টিকা: ২)

এর একটা সরল অর্থ এভাবে করা যায় "নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কিতাব।" কিন্তু এর একটা অর্থ এও হতে পারে যে, এটা এমন একটা কিতাব যাতে সন্দেহের কোন লেশ নেই। দুনিয়ায় যতগুলো গ্রন্থে অতি প্রাকৃত এবং মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সবই কল্পনা, ধারণা ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থগুলোর লেখকরাও নিজেদের রচনাবলীর নির্ভুলতা সম্পর্কে যতই প্রত্যয় প্রকাশ করুক না কেন, তাদের নির্ভুলতা সন্দেহ মুক্ত হতে পারেনা। কিন্তু এ কুরআন মজীদ এমন একটি গ্রন্থ যা আগাগোড়া নির্ভুল সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এর রচয়িতা হচ্ছেন এমন এক মহান সত্তা, যিনি সমস্ত তত্ব ও সত্যের জ্ঞান রাখেন। কাজেই এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা এবং সেজন্য এ কিতাব দায়ী নয়।

[১] এখানে (ذلك) শব্দের অর্থ - ঐটা, সাধারণতঃ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য

ব্যবহৃত হয়। এখানে (ذلك) দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ থেকে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছেঃ

১) (ذلك) শব্দের অর্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল বুঝানো হয়েছে, তখন তার অর্থ হবেঃ হে মুহাম্মাদ! (রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কিতাব যা আমি তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ করেছিলাম, তা-ই আপনার উপর নাযিল করেছি। অথবা, হে ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমাদেরকে যে কিতাবের ওয়াদা আমি তোমাদের কিতাবে করেছি সেটা এই কিতাব যা আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল করেছি।

২) এখানে (ذلك) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ আয়াতসমূহের পূর্বে মক্কা ও মদীনায় নাযিল কুরআনের অন্যান্য সূরা ও আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা। আর যেহেতু সেগুলো আগেই গত হয়েছে, সেহেতু (ذلك) দ্বারা সম্বোধন শুদ্ধ হয়েছে।

৩) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে কিতাব বলতে ঐ কিতাবকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।

৪) এখানে কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ভাল-মন্দ, রিয্ক, আয়ু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৫) এখানে ঐ কিতাব বুঝানো হয়েছে যা তিনি নিজে লিখে রেখেছেন তাঁর কাছে আরশের উপর, যেখানে লেখা আছে, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে"। [বুখারী: ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১]

৬) (الم) দ্বারা যদি পবিত্র কুরআন বুঝানো হয়ে থাকে, অর্থাৎ (الم) কুরআনের নাম হয়ে থাকে, তাহলে (ذلك الكتاب) দ্বারা (الم) বুঝানো হয়েছে।

৭) এখানে (ذلك) দ্বারা (هذا) বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ এই কিতাব যার আলোচনা হচ্ছে, বা সামনে আসছে। সুতরাং এর দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ শেষোক্ত মতই সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ। সুতরাং (الكتاب) দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে।

[২] এ আয়াতে উল্লেখিত (ريب) শব্দের অর্থ এমন সন্দেহ যা অস্বস্তিকর। এ আয়াতের বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষন করেছেনঃ

১) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

২) তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহ করো না। [ইবনে কাসীর]

৩) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এর অর্থ তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহে নিপতিত হবে না। অর্থাৎ এর সবকিছু স্পষ্ট।

৪) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ যদি কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ভালমন্দ হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাহলে (لا ريب) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন নেই।

ذٰلِكَ - ‘ঐ’শব্দটি প্রকৃত অর্থে দূরের কোন কিছুকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে ‘ঐ’আবার কখনো নিকটবর্তী বস্তুর জন্যও ব্যবহৃত হয়। তখন এর অর্থ হবে ‘এই’। এ আয়াতে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)।

ইবনু জুরাইজ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে ذٰلِكَ শব্দটি هٰذَا (এই) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি ভাষায় এ দু’টি শব্দ অনেক সময় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। কারণ আরবরা এতদুভয়ের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য করেন না। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও আবূ ‘উবাইদাহ (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ذٰلِكَ-এর উদ্দেশ্য: ذٰلِكَ–এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন অভিমত থাকলেও সঠিক কথা হল এখানে ذٰلِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য: কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তা‘আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ওপর নাযিল করেছেন। (আইসারুত তাফাসীর, জাযায়েরী)

كِتَابُ ‘গ্রন্থ’দ্বারা এখানে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। যারা এর দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে উদ্দেশ্য করেছেন তাদের মতটি সঠিক নয়।

(لَا رَيْبَ فِيْهِ)

‘কোনরূপ সন্দেহ নেই’অর্থাৎ এতে কোন সংশয়–সন্দেহ নেই। এখানে رَيْبَ শব্দটি সন্দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰي عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِثْلِهٖ)

“এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা যদি সন্দিহান হও, তবে তার সমতুল্য একটি ‘সূরা’তৈরি করে নিয়ে এসো।”(সূরা বাকারাহ ২:২৩)

এ শব্দটি আবার কখনো কখনো অপবাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবি কবি জামীল বলেন:

بثينة قالت ياجميل أربتني فقلت كلا نا يابثينة مريب

‘অর্থাৎ বুসাইনা বলল, হে জামীল! তুমি আমাকে অপবাদ দিয়েছ? আমি বললাম: হে বুসাইনা! আমরা উভয়েই উভয়ের অপবাদ দানকারী।

আয়াতে সন্দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এ কিতাব আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপ এ কিতাবে আলোচিত বিষয়সমূহ শতভাগ নিশ্চিত সত্য, এতেও কোন সন্দেহ করার সুযোগ নেই। পৃথিবীর মধ্যে কুরআন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ নেই যাকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই

টিকা: ৩)

অর্থাৎ এটি একেবারে একটি হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার গ্রন্থ। কিন্তু এর থেকে লাভবান হতে চাইলে মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, তাকে “মুত্তাকী” হতে হবে। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকতে হবে। তার মধ্যে মন্দ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ও ভালোকে গ্রহণ করার আকাঙ্খা এবং এ আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন-যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কি না সে ব্যাপারে কখনো চিন্তা করে না, যেদিকে সবাই চলছে বা যেদিকে প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যেদিকে মন চায় সেদিকে চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য কুরআন মজীদে কোন পথ নির্দেশনা নেই।

আল কুর’আন সংশয়-সন্দেহ মুক্ত একটি ঐশি গ্রন্থ

ইবনু জারীর (রহঃ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বলেন, ذٰلِكَ এর অর্থ হলো هٰذَا তথা এই কিতাব। মুজাহিদ, ইকরামাহ, সা‘ঈদ ইবনু যুবাইর, সুদ্দী মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান, যায়দ ইবনু আসলাম ও ইবনু জুরাইজ (রহঃ)-এর মত এটাই। ‘আরবগণ এ দু’টি ইঙ্গিত বাচক বিশেষ্যের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য করে না, বরং একটিকে অপরটির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তারা ব্যবহার করে থাকে। আর এটা তাদের মাঝে একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও আবূ উবাইদের সূত্রে এমনটিই বর্ণনা করেছেন। আর যামাখশারী (রহঃ) বলেন, ذلك এর مشار إليه হলো الم। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ‘তা এমন এক গরু যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয় বরং মধ্য বয়সী।’ (২ নং সূরাহ্ আল বাকারা আয়াত-৬৮)

আর মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ‘এটা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন।’ (৬০ নং সূরাহ্ আল মুমতাহিনা, আয়াত-১০) অন্য জায়গায় এসেছে, ذلكمُ الله অর্থাৎ ইনিই হলেন মহান আল্লাহ। এ রকম আরো অনেক জায়গাহ রয়েছে যেখানে ذلك এর মাধ্যমে পূর্বোল্লিখিত বস্তুর দিকে ইশারা বা ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

অবশ্য কোন কোন মুফাস্সির ذلك এর মাধ্যমে কুর'আনের দিকে ইশারা বা ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। যে কুর'আনের ওয়া'দা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেয়া হয়েছিলো। আবার কেউ তাওরাতের প্রতি এবং কেউ ইনজীলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ প্রায় দশটি উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এ উক্তিগুলোকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

كِتٰبٌ-এর অর্থ কুর'আনুল কারীম। যারা বলেছেন যে, ذلك বলে তাওরাত ও ইনজীলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা খুব দূরের রাস্তা অনুসন্ধান করেছেন অথবা খুব কষ্ট স্বীকার করেছেন। তারা এমন উক্তি করেছেন যে বিষয়ে তাদের আদৌ কোন সঠিক জ্ঞান নেই। رَيْبَ-এর অর্থ হচ্ছে সংশয় ও সন্দেহ। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) থেকে এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীর তাবারী ১/২৮) আবূদ দারদা (রাঃ), ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক নাফি' (রহঃ), যিনি ইবনু 'উমারের কৃতদাস, 'আতা (রহঃ), আবুল 'আলিয়া (রহঃ), রাবী' ইবনু আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), এবং ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালিদ (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। 'আদী ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, মুফাস্সিরগণের মধ্যে এতে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৩১) رَيْبَ শব্দটি 'আরবদের কবিতায় অপবাদের অর্থেও এসেছে। যেমন কবির উক্তিঃ

بثينة قالت يا جميل أربتني ... فقلت كلانا يا بثين مريب ...

'বুসাইনাহ বললো, হে জামীল! তুমি কি আমাকে অপবাদ দিচ্ছো? তখন আমি বললাম, হে বুসাইনাহ আমরা উভয়েই তো একজন অপরজনকে অপবাদ দাতা।' আবার হাজত বা প্রয়োজন অর্থেও ريب শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন কোন একজন কবির উক্তিঃ

قضينا من تهامة كل ريب ... وخيبر ثم أجمعنا السيوفا

'তিহামার নিম্নভূমি থেকে এবং খাইবারের মালভূমি থেকেও সব প্রয়োজন মিটিয়ে নিলাম, অবশেষে তলোয়ার গুটিয়ে নিলাম।'

অতএব لَا رَيْبَ فِيْهِ -এর অর্থ হলো এই যে, এই কিতাব অর্থাৎ আল কুর'আন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন সূরাহ্ সাজদায় মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ ﴿الٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

‘আলিফ-লাম-মীম। কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ।’ (৩২ নং সূরাহ্ সাজদাহ, আয়াত নং ১-২)

কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা خَبَر হলেও نَهِيْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ لَا تَرْتَابُوْا فِيْهِ তোমরা এতে আদৌ সন্দেহ করো না।’ কোন কোন কারী لَا رَيْبَ-এর ওপরে وَقْف করে থাকেন এবং هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-কে পৃথক বাক্য রূপে পাঠ করেন। কিন্তু لَا رَيْبَ فِيْهِ-এর ওপর وَقْف করা বা না থামা খুবই উত্তম। কেননা এই একই বিষয় এভাবেই সূরাহ্ সাজদার আয়াতে উল্লেখ হয়েছে এবং এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে فِيْهِ هُدًى-এর চেয়ে বেশি مُبَالَغَة হয়। هُدًى শব্দটি ‘আরবী ব্যাকরণ হিসবে صفت হয়ে مرفوع হতে পারে এবং حال হিসেবে منصوب ও হতে পারে।

হিদায়াত অর্জনকারীদের জন্য তাকওয়া

এ স্থানে হিদায়াতকে মুত্তাক্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ١ؕ وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى١ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ﴾

বলোঃ মু’মিনদের জন্য এটি পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং আল কুর’আন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (৪১ নং সূরাহ্ হা-মীম সাজদাহ, আয়াত নং ৪৪) অন্যত্র রয়েছেঃ

﴿وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ١ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا﴾

আমি অবতীর্ণ করি কুর’আন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া। কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ৮২)

এ বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে এবং এগুলোর ভাবার্থ এই যে, যদিও কুর’আনুল কারীম সকলের জন্যই হিদায়াত স্বরূপ, তথাপিও শুধু সৎ লোকেরাই এর দ্বারা উপকার পেয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ١ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য এটা পথ প্রদর্শক ও রহমত। (১০ নং সূরাহ্ ইউনুস, আয়াত নং ৫৭)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ও ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হিদায়াতের অর্থ হচ্ছে আলো।

মুত্তাক্বীর পরিচয়

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুত্তাক্বী তারাই যারা মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে শির্ক থেকে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী মেনে চলেন। (হাদীসটি য'ঈফ) অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মুত্তাক্বী তারাই যারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে হিদায়াতকে পরিত্যাগ করেন না এবং তাঁর রহমতের আশা রেখে তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুত্তাক্বী তারাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরে বলেনঃ

﴿الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ . وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

'যারা অদৃশ্য বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করে এবং যথা নিয়মে সালাত কায়িম করে, আর আমি তাদেরকে যে সব রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।' (২ নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ৩-৪)

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এসব গুণ মুত্তাক্বীদের মধ্যে একত্রে জমা হয়। জামি' তিরমিযী ও সুনান ইবনু মাজায় 'আতিয়াহ সা'দী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَا يَبْلُغُ الْعَبدُ أنْ يَكُونَ منَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأسَ بِهِ ، حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأسٌ.

'বান্দা প্রকৃত মুত্তাক্বী হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে ঐ সমুদয় জিনিস ছেড়ে দেয় যাতে কোন দোষ নেই এই ভয়ে যে, দোষের মধ্যে যেন না পড়ে। (জামি' তিরমিযী ৪/১৪৭, সুনান ইবনু মাজাহ ২/১৪০৯। 'আল্লামাহ্ শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেনঃ এ হাদীসের সনদটি দুর্বল। ''গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালাল ওয়াল হারাম'' গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠাতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে ''মিশকাত'' গ্রন্থের ২৭৭৫ পূর্বে হাসান আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পরে

এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ সনদের বর্ণনাকারী ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ দিমাশকী দুর্বল) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব বলেছেন।

ইবনু আবী হাতিম মায়মূন আবূ হামযার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ হামযা বলেছেন, আমি একবার আবূ ওয়ায়িলের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন লোক প্রবেশ করলো যাকে আবূ ‘আফীফ বলা হয়, যিনি মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। শাকীক ইবনু আবূ সালামাহ সেই লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবূ ‘আফীফ! আপনি কি মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে একটি ময়দানে আটকিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিবে যে, মুত্তাক্বীগণ কোথায়? তখন তারা দয়াময় আল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করবেন না। আমি বললাম মুত্তাক্বী কারা? তিনি বললেন, তাঁরা এমন সম্প্রদায়, যারা শিরক থেকে বিরত থাকে এবং প্রতিমা পূজা থেকেও বিরত থাকে। আর একমাত্র একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে মত্ত থাকে। তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হিদায়াত দু’ ধরনের

কখনো কখনো হিদায়াতের অর্থ হয় অন্তরের মধ্যে ঈমানের স্থিতিশীলতা। বান্দার অন্তরে এই হিদায়াতের ওপর মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না। পবিত্র কুর’আনে ঘোষণা হচ্ছেঃ

﴿اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ﴾

তুমি যাকে ভালোবাসো, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবে না। (২৮ নং সূরাহ্ কাসাস, আয়াত নং ৫৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ﴾

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়। (২ নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ২৭২)

অন্য স্থানে তিনি বলেনঃ ﴿مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ﴾

যাদেরকে মহান আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৭ নং সূরাহ্ আ‘রাফ, আয়াত নং ১৮৬)

অন্যত্র তিনি বলেনঃ ﴿مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾

মহান আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। (১৮ নং সূরাহ্ কাহফ, আয়াত নং ১৭)

কখনো কখনো হিদায়াতের অর্থ হয়ে থাকে সত্যকে প্রকাশ করা এবং সত্য পথ প্রদর্শন করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ اِنَّكَ لَتَهْدِیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ﴾

তুমি তো প্রদর্শন করো শুধু সরল পথ। (৪২ নং সূরাহ্ শুরা, আয়াত নং ৫২)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

তুমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। (১৩ নং সূরাহ্ রা'দ, আয়াত নং ৭)

পবিত্র কুর'আনে অন্য স্থানে আছেঃ ﴿وَ اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَیْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰی عَلَی الْهُدٰی﴾

আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিলো। (৪১ নং হা-মীম সাজদাহ, আয়াত নং ১৭)

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ هَدَیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ﴾

আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (৯০ নং সূরাহ্ বালাদ, আয়াত নং ১০)

তাকওয়া কি?

তাক্বওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো খারাপ বা অপছন্দনীয় জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। এটা মূলে ছিলো وقي যা وقاية হতে নেয়া হয়েছে। যেমন কবি বলেনঃ

... سَقَطَ النَّصِيْفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ ... فَتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

ওড়না পড়ে গেলো, অথচ সে তার পড়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। অতঃপর সে তাকে ধরলো এবং হাত দ্বারা আমাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। অন্য একজন কবি বলেনঃ

... فَأَلْقَتْ قِنَاعًا دُوْنَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ ... بِأَحْسَنِ مَوْصُوْلَيْنِ كَفٍّ وَمِعْصَمِ

সূর্যের কিরণকে আড়াল করে সে তার ওড়না ফেলে দিলো, আর নিজের হাতের তালু ও কব্জি মিলিয়ে সুন্দর ভাবে নিজেকে রক্ষা করলো।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইবনু কা'বকে (রাঃ) প্রশ্ন করেনঃ তাক্ওয়া কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথে চলার আপনার কোন দিন সুযোগ ঘটেছে কি?' তিনি বলেনঃ হ্যাঁ।' তখন উবাই (রাঃ) বলেনঃ 'সেখানে আপনি কি করেন?' 'উমার (রাঃ) বলেন, 'কাপড় ও শরীরকে কাঁটা থেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি।' তখন উবাই (রাঃ) বলেনঃ تَقْوَى ও ঐ রকমই নিজেকে রক্ষা করার নাম।

কবি ইবনু মু'তায্ এমনই অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

... خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها ذاك التقى

... واصنع كماش فوق أر ... ض الشوك يحذر ما يرى

... لا تحقرن صغيرة ... إن الجبال من الحصى

'তুমি ছোট-বড় গুনাহগুলো পরিত্যাগ করো, কেননা এটাই তাক্বওয়া, আর এমনভাবে কাজ করো, যেন তুমি একজন কাঁটাযুক্ত পথের পথিক, যা দেখে সে সতর্ক ও সজাগ থাকে। ছোট পাপ গুলোকে হালকা মনে করো না, নিশ্চয় ছোট ছোট কঙ্কর দ্বারাই পাহাড় গড়ে উঠে।

একবার আবূদ দারদা কবিতা আবৃত্তি করে বললেন,

... يريد المرء أن يؤتى مناه ... ويأبى الله إلا ما أرادا

... يقول المرء فائدتي ومالي ... وتقوى الله أفضل ما استفادا

মানুষ কামনা করে তার অন্তরের বাসনা পূরণ হোক, কিন্তু মহান আল্লাহ তা অস্বীকার করেন। তবে তিনি যা ইচ্ছা করেন শুধু মাত্র সেটাই পূরণ হয়। মানুষ বলে এটা আমার অর্জন ও সম্পদ। অথচ অর্জন ও সম্পদ এর চেয়ে আল্লাহ ভীতিই হলো সর্বাধিক উত্তম।

আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَا اسْتَفَادَ الْمَرْءُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

‘মানুষ সর্বোত্তম কল্যাণমূলক যা কিছু লাভ করে তা হলো আল্লাহ ভীতি, এরপর সতী সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী যখন তার দিকে তাকায়, তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাকে যা নির্দেশ দেয় তা সে পালন করে, কোন কসম দিলে তা পূর্ণ করে দেখায়, আর সে অনুপস্থিত থাকলে তার স্ত্রী তার মাল এবং স্বীয় নাফসের রক্ষণাবেক্ষণ করে।’ (হাদীসটি য‘ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ ১/১৮৫৭)

[৩] ‘মুত্তাকীন’ শব্দটি ‘মুত্তাকী’-এর বহুবচন। মুত্তাকী শব্দের মূল ধাতু ‘তাকওয়া’। তাকওয়া হলো, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা বিধান করা। শরী’আতের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, বান্দা যেন আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, আর তা করতে হলে যা করতে হবে তা হলো, তাঁর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নেয়া, এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করা। আর মুত্তাকী হলেন, যিনি আল্লাহ্‌র আদেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং তাঁর নিষেধ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। [ইবনে কাসীর]

বর্ণিত আছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। উবাই বললেন, কিভাবে চলেছেন? উমর বললেন, কাপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। উবাই বললেন: এটাই হলো, তাকওয়া। [ইবনে কাসীর]

তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুত্তাকীগণকে কেন হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন? এ ব্যাপারে আলেমগণ বলেন, মূলতঃ মুত্তাকীরাই আল্লাহ্‌র কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন, অন্যান্য যারা মুত্তাকী নন তারা হেদায়াত লাভ করতে পারেন না। যদিও কুরআন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এ অর্থের উপর প্রমাণবহ। আল্লাহ্‌ বলেন, “নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে

পথের দিকে যা আকওয়াম তথা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার"। [সূরা আল-ইসরা: ৯]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ কুরআন তাদের জন্য হিদায়াত যারা হেদায়াত চেনার পর তা গ্রহণ না করার শাস্তির ভয়ে সদা কম্পমান। আর তারা তাঁর কাছ থেকে যা এসেছে তার সত্যায়নের মাধ্যমে রহমতের আশাবাদী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর ও আততাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া হিদায়াতের কোন শেষ নেই, মুত্তাকীরা সর্বদা আল্লাহ্‌র নাযিল করা হেদায়াতের মুখাপেক্ষী বিধায় হেদায়াতকে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে অন্যান্য আয়াতে কুরআনকে সমস্ত মানবজাতির জন্য হেদায়াতকারী বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে এর অর্থ হলো, হিদায়াতের পথ তাদের দেখাতে পারে যদি তারা তা থেকে হিদায়াত নিতে চায়।

(هُدًي لِّلْمُتَّقِيْنَ)

'মুত্তাক্বীদের জন্য হিদায়াত'অর্থাৎ এ কুরআন মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের জন্য হিদায়াত দানকারী। যারা কাফির-মুশরিক তাদেরকে হিদায়াত দানকারী নয়। এমনটিই আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে বলেছেন, যেহেতু মুত্তাকীরাই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

(قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۤءٌ ۭ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۭ)

"বলঃ মু'মিনদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার; কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব।"(সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১:৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ)

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ।"(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৮২)

এখানে হিদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-

الهدي الخاص

(বিশেষ হিদায়াত) অর্থাৎ দীন ইসলামের দিকে হিদায়াত দিয়ে অনুগ্রহ করা, এটা শুধু মু'মিনদের জন্য। তবে الهدي العام (সাধারণ হিদায়াত), যার উদ্দেশ্য হলো সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেয়া, তাতে মু'মিন ও কাফির তথা সকল মানুষ শামিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ)

"রমযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক এবং হিদায়েতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)।" (সূরা বাকারাহ ২:১৫৮) (আযওয়াউল বায়ান, অত্র আয়াতের তাফসীর)

সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে হিদায়াত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত ও গবেষণা করবে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তারাই হিদায়াত পাবে। অন্যথায় কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে মুখস্ত ও গবেষণা করে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু হিদায়াত পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশে কুরআন নাযিল করেছেন তা গ্রহণ করে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কুরআনুল কারীম সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

২. কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ তা'আলার কালাম। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

৩. কুরআন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটি সর্বোত্তম গাইড ও জীবন বিধান।

৪. কুরআন দ্বারা কেবল মু'মিন-মুত্তাকীরা উপকৃত হয় বলে মুত্তাকীদের হিদায়াত দানকারী বলা হয়েছে। মূলত কুরআন সকলের জন্য পথ প্রদর্শক।

মুত্তাকীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য পরবর্তী তিনটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।